ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

ওষুধে জীবন ওষুধে মরণ

ওষুধের প্রতি সব বয়সের মানুষের সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতা এক নয়। বয়স্কদের যে মাত্রায় যেসব ওষুধ দেওয়া হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। ১৯৯৭ সালে ১৮ বছরের কম বয়স্ক ৩৮ লাখ শিশু-কিশোর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার মধ্যে ২ দশমিক ১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮০ হাজার শিশু-কিশোর হাসপাতালে ভর্তি হয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে। এদের মধ্যে ৩৬ হাজার শিশু-কিশোরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল জীবন বিপন্নকারী

পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে চেষ্টা করি। আমার এই প্রচেষ্টার পেছনে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বয়স কম হওয়ার কারণে ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই সুস্থ ও সবল জীবনযাপন করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ-বিমারিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো—রোগ-বিমারিতে আক্রান্ত না হলে সচরাচর কেউ স্বাস্থ্যসচেতন হয় না এবং সুস্থ থাকার জন্য অসুস্থ হওয়ার আগে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলা দরকার, তা বেশির ভাগ লোকই মেনে চলে না। এমন কিছু রোগ-বিমারি আছে, যা একবার শরীরে বাসা বাঁধলে আমৃত্যু তা আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, আর্থ্রাইটিস, হাঁপানি—এমন কিছু রোগের উদাহরণ। অথচ সময়মতো সচেষ্ট হলে, পরিমিত সুষম স্বাস্থ্যকর খাবার, প্রচুর পানি পান, লাইফস্টাইল পরিবর্তন এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে মানুষ অতি সহজে এসব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। আমরা খুব কমই ভাবি, রোগাক্রান্ত হলে শারীরিক ও মানসিক বিড়ম্বনা ছাড়াও রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধ-পথ্যের পেছনে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। তার পরও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে—এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। সুস্থ থাকা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত—এ কথাটি আমরা তখনই বুঝি, যখন আমরা অসুস্থ হই। তাই তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে আমার পরামর্শ—সুস্থ থাকতেই বাকি জীবন সুস্থ ও সবল থাকার ব্রত গ্রহণ করো। স্বাস্থ্যসচেতন হও, স্বাস্থ্যসুরক্ষায় সচেষ্ট ও যত্নবান হও, যাতে করে অসুস্থ হয়ে আজীবন ওষুধের ওপর নির্ভর করতে না হয়। কারণ রোগ-বিমারি যেমন ভালো নয়, ওষুধও তেমনি পূতপবিত্র নিষ্কণ্টক কোনো বস্তু নয়। অনেকের ধারণা, ওষুধ ভালো ও উপকারী বস্তু। কথাটি সত্য আংশিকভাবে, পুরোপুরি নয়। ওষুধ রোগ সারায়, ওষুধ আবার রোগ তৈরিও করে। ওষুধ গ্রহণ করে মানুষ আরোগ্য লাভ করে। ওষুধ সেবন করে মানুষ মৃত্যুবরণও করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। বলা হয়—সব ওষুধই বিষ। বিষ আর প্রতিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সঠিক মাত্রার সঠিক ওষুধ। তবে সঠিক মাত্রায় সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করলেই তা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হবে—এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ কোনো ওষুধই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। কোনো কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহনশীল ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলেও অনেক ওষুধের গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও মৃত্যুবরণ করতে পারে। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১৫ লাখ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়াজনিত সমস্যার কারণে। এর মধ্যে কম করে হলেও এক লাখ রোগী মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে মৃত্যু শীর্ষস্থানীয় মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। অথচ এসব মৃত্যু অনায়াসে এড়ানো যায়। মৃত্যু ছাড়াও ওষুধের ছোটখাটো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বড় ধরনের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা হয়তো জানি না বা বুঝি না যে ওষুধের কারণে মানসিক পরিবর্তন, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, মাথা ঘোরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, ডায়রিয়া, পেটে জ্বালা-পোড়ার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা মানুষের জীবনযাত্রার মানে চরম অবনতি ডেকে আনতে পারে।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নির্ভর করে ওষুধের ভৌতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। সব ওষুধের গাঠনিক সংকেত, রাসায়নিক গুণাবলি ও শরীরে কার্যপ্রণালি একরকম হয় না বলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও তারতম্য ঘটে। ক্যান্সারের ওষুধ শরীরে সবচেয়ে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্ষতির ঝুঁকি মাত্রাতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনরক্ষার জন্য ক্যান্সারের ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বহুলাংশে কমিয়ে আনা যায়, যদি ওষুধের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে—পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে প্রতিবছর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তিন-চতুর্থাংশ রোগী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য প্রদত্ত ওষুধের কারণে আবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। জীবন বিপন্নকারী এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে—কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া, কিডনি ধ্বংস, রক্তক্ষরণ, রক্তচাপ হ্রাস, লিভারের সমস্যা ইত্যাদি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত মৃত্যুহার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অন্যান্য রোগীর মৃত্যুহারের দ্বিগুণ বলে অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভুলভ্রান্তি, অবজ্ঞা, অবহেলা, রোগনির্ণয়ে ভুল সিদ্ধান্ত ও সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতাকে বহুলাংশে দায়ী করা হয়।

বিভিন্ন বয়সে মানুষের শরীরে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রকোপ কেন বাড়ে-কমে, তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমাদের মনে রাখা দরকার, ওষুধের প্রতি সব বয়সের মানুষের সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতা এক নয়। বয়স্কদের যে মাত্রায় যেসব ওষুধ দেওয়া হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। ১৯৯৭ সালে ১৮ বছরের কম বয়স্ক ৩৮ লাখ শিশু-কিশোর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার মধ্যে ২ দশমিক ১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮০ হাজার শিশু-কিশোর হাসপাতালে ভর্তি হয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে। এদের মধ্যে ৩৬ হাজার শিশু-কিশোরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল জীবন বিপন্নকারী। মহিলা ও গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রেও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পুরুষের চেয়ে বেশি হয়।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের শরীরের ওজন কমে যায়। ৪০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে শরীরের ওজন বাড়তে থাকে। ৭০ বছরের পর শরীরের ওজন খুব দ্রুত কমতে থাকে। ওজন কমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে পানির পরিমাণও কমে যায়, চর্বির পরিমাণ বাড়তে থাকে। সে কারণে তরুণদের চেয়ে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি কিলো শরীরের ওজনে ওষুধের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। শরীরে চর্বির পরিমাণ যত বাড়বে, ওষুধের ধারণক্ষমতাও তত দীর্ঘ হবে। দীর্ঘ সময় ওষুধ শরীরে অবস্থান করলে অনেক সময় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়। শরীর থেকে ওষুধ ও অন্যান্য মেটাবলাইট নিঃসরণে কিডনির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪০ বছরের পর থেকে কিডনির ওষুধ নিঃসরণের ক্ষমতা কমতে থাকে। ৬৫ বছর বয়সে মানুষের কিডনির কার্যক্ষমতা ৩০ শতাংশ কমে যায়। বয়স আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিডনির ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। তাই বয়স্কদের ওষুধ প্রদানের ক্ষেত্রে কিডনির কার্যক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হয়। শরীরের ওজন ও পানির পরিমাণ হ্রাস, চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি, কিডনি ও লিভারের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণে তরুণদের চেয়ে বৃদ্ধদের শরীরে ওষুধের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে পুঞ্জীভূত হয় এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করে। এই কারণে বৃদ্ধ মানুষ ওষুধের অসংখ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক মাত্রায় প্রদত্ত কিছু ওষুধের ক্ষেত্রেও তরুণদের চেয়ে বৃদ্ধরা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়েন। এসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে ঘুমের ওষুধ, স্নায়ুর উত্তেজনা নাশক, মরফিন, পেন্টাজোসিন জাতীয় ব্যথানাশক, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, মনস্তাত্ত্বিক রোগে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ, অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যাট্রপিন, পারকিনসন্স রোগের ওষুধ ইত্যাদি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। আস্তে আস্তে শরীরের নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রম অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। শরীর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না বলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। যেমন বৃদ্ধ বয়সে অনেকেই বিছানা থেকে বা নিচে বসা থেকে হঠাৎ উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর কারণ হলো, হঠাৎ উঠতে গেলে রক্তচাপ কমে যায়। এতে করে রক্তপ্রবাহ কমে যায় বলে মস্তিষ্কে রক্তসরবরাহ হ্রাস পায়। অল্প বয়স্ক মানুষের ঘাড়ে এক ধরনের রিসেপ্টর থাকে, যা ওঠার সময় রক্তচাপ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয়। ফলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এসব রিসেপ্টর কাজ করে না। তাই কোনো কোনো সময় মাথায় রক্তসরবরাহ ও চাপ কমে যাওয়ার কারণে হঠাৎ ওঠার সময় বয়স্করা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। এসব পরিস্থিতিতে বয়স্ক মানুষের শোয়া বা বসা থেকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। এসব ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়।

হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য রক্তচাপ কমে যাওয়াকে বলা হয় পস্টিউরাল হাইপোটেনশন (Postural Hypotension)। পস্টিউরাল হাইপোটেনশনের ফলে পড়ে গিয়ে উরুর হাড় ভাঙা বা ভাঙা, হাত-পা ভাঙা ও মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য বয়স্ক মানুষ গুরুতর আহত হন বা মৃত্যুবরণ করেন।

তরুণ বা যুবকরা বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা বা গরম সহ্য করতে পারে। গরমকালে অধিক তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্করা ঘামায় এবং তাদের রক্তনালি সম্প্রসারিত হয়। শীতকালে রক্তনালি সংকুচিত হয় বলে তাপক্ষয় কম হয়। রক্তচাপের মতো শরীরের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অকার্যকর হয়ে যায় বলে বয়স্কদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেক ওটিসি ও প্রেসক্রিপশন ড্রাগের কারণে বয়স্ক মানুষের অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাপমাত্রার উদ্ভব হয়, যা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। বয়স্ক মানুষের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এক বা একাধিক জটিল ও মারাত্মক রোগে ভোগে। হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, কিডনির সমস্যা, হতাশা, অবসাদগ্রস্ততা, ডিমেনশিয়া এসব জটিল রোগের মধ্যে অন্যতম। এসব রোগের চিকিৎসায় রোগীকে অসংখ্য ওষুধ সেবন করতে হয়। লিভার, কিডনি বা হৃৎপিণ্ড সুষ্ঠুভাবে কাজ না করলে ওষুধ কাজ শেষ করে দ্রুত শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক পরিমাণ রক্ত সঞ্চালন করতে না পারলে কিডনি পর্যাপ্ত রক্ত পায় না বলে ওষুধ নিঃসরণ কমে যায়। এতে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়। লিভারের সমস্যা থাকলে ওষুধের মেটাবলিজম (রাসায়নিক রূপান্তর) হ্রাস পাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ওষুধ অনাকাঙ্ক্ষিত সময় ধরে শরীরে অবস্থান করবে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এতসব সমস্যার জন্য একটি গুরুতর সীমাবদ্ধতা দায়ী। প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর আমরা ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করি মাত্র তিন মাসের জন্য। অথচ এসব ওষুধ আমরা বয়স্ক মানুষকে প্রদান করি ১৫ থেকে ২০ বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য। তরুণ বা যুবকের মধ্যে তিন মাসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালিয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে কয়েক দশক ধরে ওষুধ প্রয়োগের বিধান যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। শিশু ও মহিলাদের বেলায় পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন না করে ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগের কারণে অতীতে বহু মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। থ্যালিডোমাইড (Thalidomide) ট্রাজেডি তার মধ্যে অন্যতম। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখন নিয়ম করেছে, যে বয়সের মানুষ ওষুধ গ্রহণ করবে, সেই বয়সের মানুষের ওপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন করতে হবে।

তরুণ ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভীষণ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, যা সচরাচর রোগী বা চিকিৎসক বুঝতে পারে না। এ কারণে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন ড্রাগ প্রদানে সতর্ক হতে হবে। তাঁদের কম মাত্রায় যত কমসংখ্যক ওষুধ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক মানুষদের ওষুধ প্রদানের সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন সিস্টেমের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করে ওষুধ প্রদান আবশ্যক। নতুবা ওষুধের অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার কারণে অযথা রোগীকে ভুগতে হবে, নতুবা মরতে হবে।

এবার ওষুধের কিছু গুরুতর ও ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উল্লেখ করছি। প্রসব বেদনা উদ্রেককারী ওষুধ মিসোপ্রোস্টল ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো গর্ভপাত, গর্ভস্রাব ও জরায়ুর রক্তক্ষরণ, ডায়াজেপাম ও মরফিন ব্যবহারে আসক্তি, অ্যাসপিরিন ব্যবহারে অন্ত্রে রক্তক্ষরণ, অ্যান্টিবায়োটিক জেন্টামাইসিন ব্যবহারে বধিরতা ও কিডনি বিকল হওয়া, প্রোপকল ব্যবহারে সিডেশন পরবর্তী শিশুমৃত্যু, ইন্টারফেরনের কারণে হতাশা ও লিভার ধ্বংস, মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের কারণে ডায়াবেটিস, স্থূলতার ওষুধ অরলিস্টেটের কারণে ডায়রিয়া, টিকার কারণে জ্বর, অ্যান্টিকোলেস্টেরল ড্রাগ ব্যবহারের কারণে যৌন কামনা হ্রাস বা ধ্বংস, অ্যাপেথি বা র‍্যাবডোমাইওলাইসিস, অ্যান্টিহিস্টামিন সেবনের ফলে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও ক্ষুধা বৃদ্ধি, নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে সিলডেনাফিল (ভায়েগ্রা) ব্যবহারের ফলে স্ট্রোক ও হৃদরোগ, রফেকক্সিব, ডায়াবেটিসের ওষুধ রজিগ্লিটাজোন ব্যবহারের কারণে হৃদরোগ ও স্ট্রোক, প্রাইওগ্লিটাজোনের কারণে অন্ত্রে ক্যান্সার, গ্যাটিফ্লক্সাসিন সৃষ্টি করে অন্ত্রের ক্ষত ও রক্তক্ষরণ, স্থূলতার ওষুধ সিবুট্রামিন সৃষ্টি করে হৃদরোগ, থ্যালিডোমাইড ব্যবহারের কারণে গর্ভজাত শিশুর অঙ্গহানি বা অঙ্গবিকৃতি, ফ্লুপেন্টিক্সল-মেলিট্রাসিনের ব্যবহারের কারণে মূত্রথলিতে ক্যান্সার উৎপাদন ইত্যাদি।

পরিশেষে আমার একটি ক্ষুদ্র পরামর্শ হচ্ছে, ওষুধের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করুন এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত জীবনযাপন করুন। অসুস্থ হওয়ার আগেই আজীবন সুস্থ থাকার ব্রত গ্রহণ করুন।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মাসি অনুষদ, ঢাবি
drmuniruddin@gmail.com